ই-গভর্নেন্সে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে কেন?

আমিনূল মোহায়মেন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে কতদূর এগোতে পেরেছে প্রতি বছর তার একটি তালিকা প্রকাশ করে আসছে আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটি। এবছর ১৯৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে ১৫৫তম অবস্থানে যেখানে গত বছর আমাদের অবস্থান ছিল ৮৬তম। এ তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ান। তাদের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। অপরদিকে এক বছরের মধ্যে ভারত ৭৭ থেকে ৪৭, নেপাল ১০৬ থেকে ৬০, পাকিস্তান ১৩৫ থেকে ৭২ এবং ভুটান ৩৯ থেকে ৩০তম অবস্থানে চলে এসেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া নিছক জাতীয় ইমেজের ব্যাপার নয়, বরং এর সাথে সরকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের প্রাতিষ্ঠানিকতা - ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। এ নিবন্ধে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সেগুলি কাটিয়ে ওঠার পন্থা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্সের মূল কথা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি, বিশেষ করে ইন্টারনেট, ব্যবহার করে সরকারী সেবাসমূহ জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া। যেমন ধরুন, আপনি একটি পাসপোর্ট করবেন। আপনি ইন্টারনেটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের (এ ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট দপ্তর) ওয়েবসাইটে ঢুকে জানতে চাইবেন পাসপোর্টের জন্য কিভাবে, কোথায়, কোন ফরমে আবেদন করতে হবে, আবেদন পত্রের সাথে কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে, কোথায় জমা দিতে হবে ইত্যাদি। এ সকল কাগজপত্র জোগাড় করে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে আবেদন পত্রটি জমা দেয়ার পর আপনাকে একটি নম্বর দেয়া হবে পরবর্তীতে যা ব্যবহার করে আপনি জানতে পারবেন আপনার পাসপোর্ট কোন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে কোথায় রয়েছে তা একটি ছোট খবর থেকেই বোঝা যাবে। দৈনিক নয়া দিগন্তের ১১ আগস্ট, শনিবার সংখ্যার ১০ম পাতায় বক্স করে যে খবরটি ছাপা হয়েছে, তার শিরোনাম, 'রাত তখন দেড়টা'। ছবিতে দেখা যাচ্ছে গভীর রাতে ফুটপাতে অপেক্ষামান একদল লোক। দেখে মনে হবে বন্যাদুর্গত মানুষেরা ভিটেমাটি হারিয়ে এখানে এসে অপেক্ষা করছে ত্রাণের জন্য। কিন্তু না, তারা এসেছেন পাসপোর্ট করতে। রিপোর্টারের ভাষায়, 'খোলা আকাশের নীচে, বাড়ি বা দোকানের বারান্দায় পত্রিকার কাগজ বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছেন পাঁচশত মানুষ। তাদের সবাই একটি পাসপোর্টের জন্য রাত কাটাচ্ছেন অনিশ্চয়তায়। পরের দিন পাসপোর্টের ফরম জমা দেয়া বা পাসপোর্ট হয়েছে কিনা তা জানতে লাইনে দাড়াতে হবে।' ই-গভর্নেন্সে থাকলে পাসপোর্ট অফিসের ওয়েবসাইটে গিয়েই দেখা যেতো পাসপোর্টের আবেদনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে উক্ত অফিসের ওয়েবের ঠিকানা দেয়া রয়েছে। কিন্তু সে ঠিকানায় কিছুই নেই। সরকারের অন্যান্য যে সাইটগুলো রয়েছে তাদের অধিকাংশের অবস্থাও ভালো নয়। কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যায় ২০০৬-০৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পার্শে জ্বলা-নেভা অক্ষরে লেখা 'নতুন'। দেখেই বোঝা যায় কোন এক সময় ওয়েবসাইটটি তৈরী করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা আর হালনাগাদ করা হয়নি। আমাদের সরকার সমূহ সবসময় ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। এ ধরণের সরকারী ওয়েবসাইট সারা বিশ্বের সামনে তাদের কোন ভাব ও মূর্তি তুলে ধরে তা দেখার সময় এসেছে।

অথচ, ই-গভর্নেন্সের চালু নিয়ে ঢাক ঢোল কম পেটানো হয়নি। এ জন্য বিগত সরকারের আমলে একটি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপারসন করে মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ সরকরী কর্মকর্তা ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগনকে নিয়ে জাতীয় আইসিটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়, তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিবকে সভাপতি করে ১৫ সদস্যের আইসিটি কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়, এই টাস্ক ফোর্স ও কমিটিকে সহায়তা করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রকল্প নেয়া হয়। এর বাইরেও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পেও তথ্য প্রযুক্তি ও ই-গভর্ননেন্স সম্পর্কিত বিভিন্ন অংগ রয়েছে। কিন্তু এতো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি ও কোটি কোটি টাকার প্রকল্প স্বত্তেও গত ই-গভর্ননেন্স প্রবর্তনে বাংলাদেশ তেমন সফল হতে পারেনি মূলতঃ তিনটি কারণে।

১. এ ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসাবে কাজ করেছে সরকারের পরতে পরতে জমে থাকা দুর্নীতি যাকে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে সযত্নে লালন করা হয়েছে। যেমন পাসপোর্টের কথাই ধরুন। ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি যদি বিস্তারিত জানতে পারেন যে কি কি করতে হবে, কোথায় করতে হবে, কোন কোন কাগজপত্র লাগবে এবং কাগজপত্র জমা দেয়ার পর পাসপোর্ট ইস্যূ প্রক্রিয়ার প্রতিটা ধাপ যদি ঘরে বসে ইন্টারনেট থেকে বা মোবাইল ফোনে আপনি দেখতে পারেন তাহলে পাসপোর্ট অফিসের দালালদেরকে অবশ্যই আপনি টাকা দিবেন না। দালালেরা টাকা দিবে না উক্ত অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আর তারা ‘ভালো পোস্টিং’ এর জন্য ক্ষমতাশীন রাজনীতিক কিংবা তাঁদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে উপহার, চাঁদা ইত্যাদি দিবে না।

২. ওয়েব যে একটি গণমাধ্যম তা আমাদের সরকারী ও বেসরকারী নীতি নির্ধারকগণ এখনও ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারছেন না। যেহেতু তথ্য-প্রযুক্তিকর্মীরাই এ মিডিয়াটি নিয়ে প্রথমে হৈচৈ করেছিল, তাই এটিকে নিতান্ত তথ্য প্রযুক্তির বিষয় হিসাবেই মানুষ ধরে নিয়েছে। এ কারণে দেখা যায় সরকারের ওয়েবসাইটের মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনার সব কাজই কোন তথ্য প্রযুক্তি কর্মীকে দিয়ে দেয়া হয় এবং খুব কমক্ষেত্রেই কোন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞকে এ কাজে জড়ানো হয়।

৩. সাধারণ জনগণের প্রতি সরকারের বহুদিন থেকে চলে আসা শাসক মনোভাবও এ ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করেছে। এখনও তাঁরা ভাবতে পারছেন না যে ‘পাবলিক’ তাদের টেবিলে ধর্ণা দিবে না বরং তারা ‘পাবলিকের’ কাজ নিজ উদ্যোগে করে আবার তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে কাজটি কি পর্যায়ে রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ই-গভর্নেন্স চালুর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোন সরকার দুর্নীতি দমনকে এক নম্বর এজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করেছে, দুর্নীতির বিষয়ে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছে এবং কয়েক মাসের শাসনামলে দুর্নীতি দমনে যথেষ্ঠ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। দেশ থেকে দুর্নীতির শিকড় চিরতরে উপড়ে ফেলার জন্য এর থেকে বড় সুযোগ আর কখনও আসবে কিনা সন্দেহ। ফলে ই-গভর্নেন্স চালুর সবথেকে বড় বাধাটি দূরীভূত হয়েছে। এদিকে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে ইন্টারনেট সেবাও পৌঁছে গেছে। সব মিলিয়ে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে অতি দ্রুত ই-গভর্নেন্স এটিই প্রকৃষ্ট সময়। এ জন্য সরকার নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারেঃ

প্রথম ধাপে সরকারের সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। বর্তমানে সবগুলো মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওয়েবসাইট রয়েছে। কিন্তু তাতে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদির খুব কমই দেয়া হয়ে থাকে। এই তথ্যগুলো প্রকাশের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সকল তথ্যের মধ্যে থাকতে পারে - পাসপোর্ট তৈরী সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও ফরম, পাসপোর্ট অফিসসমূহের ঠিকানা ও ফেন নম্বর, থানায় সাধারণ ডায়েরী করার নিয়মাবলী, থানা সমূহের ঠিকানা ও ফোন নম্বর (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির পরিমাণ, সেগুলি পাবার মাপকাঠি (শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়), সরকারী হাসপাতাল সমূহের কোনটিতে কি কি সেবা পাওয়া যায়, সেগুলির মূল্য ও নিয়মাবলী, হাসপাতালসমূহের ঠিকানা ও ফোন নম্বন, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সমূহ কি কি কোথায় দেয়া হয় এবং সেগুলি কিভাবে পেতে হবে (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়), বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা ইত্যাদির পরিমাণ, কারা সেগুলি পাবার যোগ্য এবং কিভাবে পাবে, কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র এবং এতিমখানাসমূহ কোথায় কোথায় অবস্থিত এবং সেগুলিতে ভর্তির নিয়মাবলী, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং তা পাবার নিয়ম, দুস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের সেবা সমূহ, ঠিকানা এবং সে সেবা পাবার নিয়ম (সমাজকল্যান এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়), ভিজিএফ, টিআর, জিআর ইত্যাদির মাধ্যমে যে সকল বরাদ্দ দেয়া হয় তার মাথাপিছু পরিমাণ ও পাবার নিয়মাবলী, সরকারী উদ্যোগে ক্রয়কৃত খাদ্যশস্যের ক্রময়মূল্য (খাদ্য মন্ত্রণালয়), যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ঠিকানা, ফোন নম্বর, তাদের পরিচালিত কোর্সসমূহ (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), সারের ডিলারশীপ পাবার নিয়মাবলী, ডিলারদের তালিকা, সারের মূল্যতালিকা, কৃষি বিপনান সংক্রান্ত যে সকল সেবা দেয়া হয়ে থাকে তার বিবরণ ও প্রাপ্তিস্থান (কৃষি মন্ত্রণালয়), মৎস, পোল্ট্রী, ছাগল, গরু ও অন্যান্য পশু পালন সংক্রান্ত যে সকল পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে সে গুলির বিবরণ ও প্রাপ্তিস্থান (মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয়), শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের নিয়মাবলী, নির্ধারিত ফরম, ফি ও যোগাযোগের স্থান (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়), ট্রেড লাইসেন্স ও আমদানী-রফতানী সংক্রান্ত অন্যান্য লাইসেন্স পাবার নিয়মাবলী ও ফরম (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়), ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট ইত্যাদি পাবার নিয়মবালী ও ফরম (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়), ভূমি রেজিস্ট্রেশনের নিয়মবালী ও ফি (ভূমি মন্ত্রণালয়), সরকার অনুমোদিত আবাসন প্রকল্পসমূহের বিবরণসহ তালিকা, এপার্টমেন্ট ক্রয়ের পর যে সকল প্রক্রিয়া (যেমন নামজারী) সম্পন্ন করতে হয় তাদের তালিকা, নিয়মমাবলী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঠিকানা ইত্যাদি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের টেলিফোন নম্বর ও সরকারের ওয়েবসাইটে থাকা প্রয়োজন। উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি সরকারের কাছে রয়েছে, সেগুলি কোন সফটওয়্যার ফার্মকে দিলে তারা কয়েক দিনেই অল্প টাকার বিনিময়ে ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে পারে। এ সকল তথ্যাদি ইন্টারনেটে প্রকাশ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে সেগুলি যেন সহজে খুজে পাওয়া যায়। সরকার সিদ্ধান্ত নিলে এ ধাপটি সম্পন্ন করতে দুই সপ্তাহের বেশী লাগার কথা নয়।

এরপর জনগন যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারের সাথে তাদের লেনদেনগুলো করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ধরুন আপনি একটি ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছেন। আপনি ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারবেন যে, আপনার আবেদনটি অনুমোদনের কি পর্যায়ে রয়েছে। আপনাকে এ তথ্য জানাতে হলে আপনার আবেদন পত্রটির অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায় কম্পিউটার ডেটাবেজে সংরক্ষণ করতে হবে। এর ফলে যে তথ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা ব্যবহার করে প্রশাসনকে আরও বেশী কর্মদক্ষ, গতিশীল ও দূর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। এ ধরণের তথ্য ব্যবস্থা থাকলে খুব সহজেই বোঝা যাবে কোন কর্মকর্তার টেবিলে ফাইল বেশীদিন পড়ে থাকে; ফলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে। তাছাড়া বিভিন্ন দফতরের কার্যক্রমের বিষয়ে জনগনের অভিযোগ থাকতে পারে। সে সকল

অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারলে উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ব্যবস্থা নিতে পারেন। যে সকল দপ্তরে জনগণকে বিভিন্ন বিষয় অনুমোদন বা কাগজ-পত্র পাওয়ার জন্য যেতে হয় যেমন পাসপোর্ট অফিস, রাজউক, টেলিফোন অফিস, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন ধরণের রেজিস্ট্রেশন অফিস ইত্যাদিতে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করতে হবে। বেশ কিছু অফিসে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে প্রকল্প নেয়া হয়েছে এবং বিনিয়োগ বোর্ডের মত দুই একটি প্রতিষ্ঠানে তা সফলভাবে বাস্তবায়নও করা হয়েছে। এই ধাপটি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এটি বাস্তবায়ন সব থেকে কঠিন কেননা, এ ধাপে একদিকে যেমন সরকারের দফতরগুলোর কাজের ধরণ কিছুটা পাল্টে যাবে, তেমনি দূর্নীতির পথও অনেকটাই রুদ্ধ হবে।

বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইটের গুণগতমান নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এক একটি মন্ত্রণালয়/দপ্তরের ওয়েবসাইটে এক এক ধরণের রং, ফন্ট, গেট-আপ ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়টি অনেকটা একই বই এর বিভিন্ন পাতায় বিভিন্ন ধরণের রং, ফন্ট, গেট-আপ ব্যবহারের মত। এ ধরণের ওয়েবসাইট যে শুধু পাঠক-দর্শককে বিকর্ষিত করে তাই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে অতি নিম্ন ধারণাও সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে অতি দ্রুত একটি স্টান্ডার্ড নির্ধারণ করে সে অনুসারে সাইটগুলো ঘষামাজা প্রয়োজন। তাছাড়া সাইটগুলো নিয়মতি হালনাগাদ করার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরগুলো যে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়েবসাইট তৈরী করেছে, তাদের সাথে নিয়মিত হালনাগাদের ব্যাপারে চুক্তি করতে পারে।

ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার। এটিকে পুরোপুরি এবং সম্ভাব্য সকম ক্ষেত্রে চালু না করা গেলে এই সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে আবারো দুর্নীতির মহোৎসব শুরু হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই এখনই সময় ই-গভর্নেন্স চালুর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার। এ জন্য সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে - এটিই আমাদের প্রত্যাশা।